সকল অধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসমূহ

অধ্যায়-১: গৃহ সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার

১. সকল চাহিদা পূরণের হাতিয়ার– সম্পদ।
২. সম্পদের প্রয়োজন মেটানোর ক্ষমতাকে বলা হয়– উপযোগ।
৩. পরিবারের লক্ষ্য অর্জন সম্ভব– সম্পদের যৌথ ব্যবহারে।
৪. বস্তুগত সম্পদ সবচেয়ে মূল্যবান ও কার্যকর– অর্থ।
৫. সম্পদের সদ্ব্যবহার করে পৌঁছানো যায়– অভীষ্ট লক্ষ্যে।
৬. করণীয় কাজ সম্পর্কে ধারণা হয়– সময় তালিকার মাধ্যমে।
৭. সময় তালিকা অনুসরণ করলে বৃদ্ধি পায়– কাজের দক্ষতা ও গতিশীলতা।
৮. সময় তালিকা হতে হবে– নমনীয়।
৯. সবার জন্য সমান ও সীমিত সম্পদ– সময়।
১০. সময় তালিকা তৈরিতে কাজের অগ্রাধিকার দিতে হয়– গুরুত্ব অনুসারে।
১১. শক্তির সদ্ব্যবহারের জন্য প্রয়োজন– পরিকল্পনা।
১২. পরিবারের কাজগুলো ভাগ করে দিতে হয় সদস্যদের– বয়স, দক্ষতা ও পছন্দ অনুযায়ী।
১৩. অর্থ ব্যয়ের পূর্ব পরিকল্পনা হলো– বাজেট।
১৪. আয়-ব্যয় সম্বন্ধে ধারণা হয়– বাজেটের মাধ্যমে।
১৫. আয় ও ব্যয়ের অর্থ সমান হয়– সুষম বাজেটে।
১৬. ব্যয়ের পরও অর্থ উদ্বৃত্ত থাকে– উদ্বৃত্ত বাজেটে।
১৭. ঋণের বোঝা বাড়ায়– ঘাটতি বাজেট।
১৮. যৌথ সম্পদ ব্যবহারে অসতর্কতার ফলে সৃষ্টি হয়– মনোমালিন্য।
১৯. যৌথ সম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে ত্যাগ করতে হবে– ব্যক্তিগত স্বার্থ।
২০. যোগাযোগের অন্যতম সহজ মাধ্যম– টেলিফোন।
২১. যৌথ সম্পদ ব্যবহার করতে হয়– সমঝোতা ও সহনশীলতার মাধ্যমে।
২২. খবরের কাগজ বাড়ির ছোট সদস্যরা পড়বে— সমবেত বা পর্যায়ক্রমে।

অধ্যায়-২: গৃহ পরিবেশে নিরাপত্তা

১. প্রাথমিক চিকিৎসার সরঞ্জামাদি রাখার বাক্সকে বলা হয়– ফার্স্ট এইড বক্স।
২. আঙুলে চাপ লাগলে সেই স্থান হয়– নীল রঙের।
৩. কোনো স্থানে গরম ভাপ লাগলে লাগাতে হবে– বরফ, ঠান্ডা পানি, নারিকেল তেল।
৪. মৌমাছি, পিঁপড়া কামড়ালে লাগাতে হবে– লেবুর রস, পেঁয়াজের রস।
৫. নখের কোণা দেবে গেলে মুছতে হবে– জীবাণুনাশক ক্রিম দিয়ে।
৬. গলায় কাঁটা আটকালে গিলে খেতে হয়– শুকনা ভাত।
৭. সুচ জীবাণুমুক্ত করা হয়– আগুনে পুড়িয়ে।
৮. চোখে কিছু পড়লে দিতে হবে– ঠান্ডা পানির ঝাপটা।
৯. অজ্ঞান হওয়ার সাথে সাথে ব্যক্তিকে শুইয়ে দিতে হয়– চিৎ করে।
১০. অজ্ঞান ব্যক্তির মস্তিষ্কে রক্ত সরবরাহের জন্য– পা উঁচু করে রাখতে হবে।
১১. সাপের উপদ্রব বৃদ্ধি পায়– বর্ষাকালে।
১২. সাপে দংশিত স্থান গভীর করে কাটতে হবে– হাফ ইঞ্চি বা ১ সে.মি.।
১৩. বিষধর সাপ কামড়ালে আক্রান্ত স্থানের ওপর বাঁধন দিতে হয়– দুইটি।
১৪. হাড় ফেটে বা ভেঙে গেলে আক্রান্ত স্থান বাঁধতে হবে– কাঠের তক্তা বা বাঁশের চটার উপর।
১৫. পানিতে ডুবে যাওয়া ব্যক্তিকে তুলে এনে লক্ষ করতে হবে– শ্বাসক্রিয়া ও নাড়ির স্পন্দন।
১৬. পানিতে ডোবা ব্যক্তির পানি বের করতে হবে– পেটে ও বুকে চাপ দিয়ে।
১৭. কেউ তড়িতহাত হলে সাথে সাথে বন্ধ করে দিতে হবে– মেইন সুইচ।
১৮. তড়িতাহত ব্যক্তিকে ধাক্কা দিতে হয়– শুকনো কাঠ বা বাঁশ দিয়ে।
১৯. তড়িতাহত ব্যক্তিকে উদ্ধার করতে পরতে হবে– রাবারের স্যান্ডেল ও দস্তানা।

অধ্যায়-৩: গৃহে রোগীর শুশ্রূষা

১. রোগীর কক্ষ হতে হবে–কোলাহলমুক্ত, স্বাস্থ্যকর, আলোবাতাসপূর্ণ।
২. রোগীর কক্ষের পর্দা হবে– হালকা বা সাদা রঙের।
৩. রোগীর পরিচর্যা করতে হবে– আন্তরিকতা ও সহানুভূতির সাথে।
৪. সুস্থ অবস্থায় আমাদের দেহের তাপমাত্রা থাকে– ৯৮.৪° ফারেনহাইট ।
৫. থার্মোমিটারের গায়ে দাগ কাটা থাকে– ৯৪°-১০৮° ফারেনহাইট পর্যন্ত।
৬. শরীরের তাপমাত্রা মাপার জন্য থার্মোমিটার দেহের নির্দিষ্ট স্থানে রাখতে হয়– ২ মিনিট।
৭. নাড়ির গতি নির্ণয়ের জন্য প্রয়োজন– সেকেন্ডের কাঁটাযুক্ত ঘড়ি।
৮. সদ্যজাত শিশুর নাড়ির স্পন্দন প্রতি মিনিটে– ১৩০-১৪০ বার।
৯. প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষের নাড়ির স্পন্দন প্রতি মিনিটে– ৬০-৭২ বার।
১০. অসুস্থ অবস্থায় রোগীর বিশেষ চাহিদা অনুসারে যে খাদ্য দেওয়া হয় তাই হলো– পথ্য।
১১. রোগীর পথ্য তৈরিতে বিবেচনা করতে হবে– রোগের প্রকৃতি, রোগীর বয়স, রুচি ইত্যাদি।
১২. বেশি জ্বরে আক্রান্ত রোগীর পথ্য হবে– ক্যালরিবহুল, সহজপাচ্য।
১৩. কোয়াশিয়রকর রোগে আক্রান্ত শিশুকে খাওয়াতে হয়– প্রোটিনযুক্ত খাবার।
১৪. ডায়াবেটিস হলে নিয়ন্ত্রণ করতে হয়– কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাদ্য।
১৫. কিডনি রোগে আক্রান্তদের কম গ্রহণ করতে হয়– প্রোটিন জাতীয় খাদ্য।

অধ্যায়-৪: বয়ঃসন্ধিকাল

১. ১০-১১ বছর থেকে ১৮-১৯ বছর পর্যন্ত সময়কে বলা হয়– কৈশোরকাল।
২. কৈশোরকালের অপর নাম– বয়ঃসন্ধিকাল।
৩. বয়ঃসন্ধিকাল হিসেবে বেশি গুরুত্বপূর্ণ– ১০/১১ বছর থেকে ১৪/১৫ বছর।
৪. নির্দিষ্ট বয়সের আগে বয়ঃসন্ধিক্ষণের পরিবর্তন হলে তাকে বলা হয়– অকাল পরিপক্ব।
৫. নির্দিষ্ট বয়সের পরে বয়ঃসন্ধিক্ষণের পরিবর্তন হলে তাকে বলা হয়– বিলম্বিত পরিপক্ব।
৬. বয়ঃসন্ধিকালের পরিবর্তনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য– ওজন, উচ্চতা বৃদ্ধি ও যৌনাঙ্গের পরিবর্তন।
৭. বয়ঃসন্ধিক্ষণ বয়সকে বলা হয়– ঝড়-ঝঞ্ঝার বয়স।
৮. উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন জৈব রাসায়নিক পদার্থ হলো– হরমোন।
৯. মানুষের দেহের বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করে– গ্রোথ হরমোন।
১০. পিটুইটারি গ্রন্থি অবস্থিত– মস্তিষ্কের তলদেশে।
১১. শুক্রাশয়ের বৃদ্ধি ঘটায়– গোনাডোট্রপিক হরমোন।
১২. শুক্রাশয় থেকে ক্ষরিত হরমোন হলো– টেস্টোস্টেরন।
১৩. ডিম্বাশয়ের পূর্ণতা দান করে– গোনাডোট্রপিক হরমোন।
১৪. ডিম্বাশয় থেকে ক্ষরিত হরমোন হলো– ইস্ট্রোজেন।
১৫. বয়ঃসন্ধিক্ষণে ছেলেমেয়েরা চলতে পছন্দ করে– স্বাধীনভাবে।

http://teachingbd.com

১৬. প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জনের উপযুক্ত সময়– বয়ঃসন্ধিক্ষণ।
১৭. মাধ্যমিক স্কুলের পড়াশোনা ভালো না লাগার কারণ– বিষয়বস্তু অস্পষ্টতা, না বুঝে মুখস্থ করা।
১৮. ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশোনায় আগ্রহ সৃষ্টি করে– শিক্ষকের প্রশংসা।

অধ্যায়-৫: রোগ সম্পর্কে সতর্কতা

১. শরীরে জীবাণু প্রবেশ করে– খাদ্য, শ্বাসগ্রহণ ও চামড়ার মাধ্যমে।
২. মায়ের প্রথম দুধকে বলা হয়– শালদুধ।
৩. কলোস্ট্রাম নামক পদার্থ রয়েছে– শালদুধে।
৪. শিশুর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সৃষ্টি করে– কলোস্ট্রাম।
৫. শিশুর দেহের তাপমাত্রা থাকে– ৯৯° ফারেনহাইট।
৬. শিশুর মস্তিষ্ক ও স্নায়ুতন্ত্রের জন্য ক্ষতিকর– উচ্চ জ্বর।
৭. জ্বর হলে শরীর থেকে বেরিয়ে যায়– সোডিয়াম, পটাশিয়াম ও পানি।
৮. বিপাক ক্রিয়া বৃদ্ধি পায়– জ্বর হলে।
৯. ডায়রিয়া হলো– পানিবাহিত রোগ
১০. ডায়রিয়ায় খাদ্যদ্রব্য বেশিক্ষণ অন্ত্রে না থাকায় সম্পূর্ণ হয় না– পরিপাক ও বিশোষণ।
১১. শিশুর মাথার তালুর মধ্যভাগ দেবে যায়– ডায়রিয়া হলে।
১২. ডায়রিয়া হলে শিশুকে খাওয়াতে হয়– স্যালাইন।
১৩. ডায়রিয়া হলে শরীর থেকে বের হয়ে যায়– সোডিয়াম, ক্লোরাইড, পটাশিয়াম বাই কার্বনেট, গ্লুকোজ।
১৪. ঘরে তৈরি স্যালাইন খেতে হবে– ১২ ঘণ্টার মধ্যে।
১৫. ডায়রিয়ার রোগীকে স্যালাইন খাওয়ানোর মূল উদ্দেশ্য– ডিহাইড্রেশন রোধ করা।
১৬. ইনফ্লুয়েঞ্জা হলো– ভাইরাসজনিত, বায়ুবাহিত সংক্রামক ব্যাধি
১৭. শিশুদের ক্ষেত্রে ইনফ্লুয়েঞ্জা স্থায়ী হয়– ৫–৭ দিন
১৮. প্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রে ইনফ্লুয়েঞ্জা স্থায়ী হয়– ৩–৫ দিন
১৯. কৃমি মানুষের অন্ত্রে থাকে– পরজীবী রূপে।
২০. গোলকৃমিতে আক্রান্ত হলে শিশুর– পেট ফুলে যায়, ওজন কমে যায়।
২১. সুতাকৃমি ডিম পাড়ে– মলদ্বারে
২২. বক্রকৃমিতে আক্রান্ত হলে– শিশুর রক্তস্বল্পতা হয়, ফ্যাকাশে দেখায়।
২৩. হামের লক্ষণ দেখা দেয় শরীরে ভাইরাস প্রবেশের– ১৪ দিনের মধ্যে।
২৪. হাম সেরে যাওয়ার পর শিশুরা আক্রান্ত হয়– নিউমোনিয়া, ও ডায়রিয়ায়।
২৫. যক্ষ্মা রোগের ব্যাকটেরিয়া হলো– মাইক্রো-ব্যাকটিরিয়াল টিউবারকুলোসিস।
২৬. পোলিও রোগে বেশি আক্রান্ত হয়– ১০ বছরের কম বয়সের শিশুরা।
২৭. মাম্পস রোগে বেশি আক্রান্ত হয়– ৫–১৫ বছর বয়সের শিশুরা
২৮. মাম্পস রোগ বেশি হয়– শীতকালে।
২৯. ইপিআই কর্মসূচির লক্ষ্য হচ্ছে– শিশুদের অকাল মৃত্যু ও পঙ্গুত্ব রোধ করা।
৩০. বিসিজি টিকা দেওয়া হয়– যক্ষ্মা রোগে।
৩১. পোলিও রোগ প্রতিরোধ করে– ওপিভি টিকা।
৩২. পাঁচটি টিকার সমন্বয় হলো– পেন্টাভ্যালেন্ট ভ্যাকসিন।
৩৩. পেন্টাভ্যালেট ভ্যাকসিনের প্রথম ডোজ দেয়া হয়– জন্মের ৬ সপ্তাহ পর।
৩৪. পেন্টাভ্যালেন্ট ভ্যাকসিনের দ্বিতীয় ও তৃতীয় ডোজ দিতে হয় প্রথম ডোজের– ২৮ দিন অন্তর অন্তর।
৩৫. ধনুষ্টংকার প্রতিরোধ করে– টিটি টিকা।
৩৬. টিটি টিকা দেওয়া হয়– ১৫-৪৯ বছর বয়সী মহিলাদের।

অধ্যায়-৬: বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু

১. বুদ্ধিবৃত্তীয় ও আচরণগত সীমাবদ্ধতার শিকার– অটিস্টিক শিশুরা।
২. বিকাশগত অক্ষমতা ও নিউরোবায়োলজিক্যাল ডিজঅর্ডার বলা হয়– অটিজমকে।
৩. মেয়ে ও ছেলে শিশুদের অটিজমে আক্রান্ত হওয়ার অনুপাত– ১ ঃ ৪।
৪. শিশুর অটিজমের লক্ষণ প্রকাশ পায় – দেড় থেকে তিন বছরের মধ্যে।
৫. অটিস্টিক শিশুদের মধ্যে খিচুনি থাকে– পঁচিশ শতাংশ শিশুর।
৬. যেসব অটিস্টিক শিশুদের বুদ্ধিবৃত্তীয় অক্ষমতা থাকে না তাদের বলা হয়– অ্যাসপারগার সিনড্রোম।
৭. অটিস্টিক শিশুদের মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তীয় অক্ষমতা থাকে না– ২০-৩০% শিশুর।
৮. বিশ্ব অটিস্টিক সচেতনতা দিবস– ২ এপ্রিল।
৯. বুদ্ধি প্রতিবন্ধীদের IQ — ৭০ বা এর নিচে।
১০. সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্নদের IQ হয়– ১০০।
১১. IQ ১৩০ এর উপরে হয়– প্রতিভাবানদের।
১২. পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে অনেক কিছু শেখে– প্রতিভাবান শিশুরা।
১৩. প্রতিভাবানদের মধ্যে বেশি থাকে– স্বাতন্ত্র্য ও নিজস্বতা।

অধ্যায়-৭: বিভিন্ন প্রতিকূল অবস্থা থেকে নিজেকে রক্ষা করা

১. যে অবস্থা আমাদের কাম্য নয়, ভালো করে না তা– প্রতিকূল অবস্থা।
২. ছেলেমেয়েরা মাদক গ্রহণের অভিজ্ঞতা অর্জন করে– কৌতূহলের বশে।
৩. মাদকাসক্তির শারীরিক ক্ষতি হলো– হৃদযন্ত্রের ক্ষতি, অনিদ্রা, অরুচি।
৪. মাদকাসক্তির মানসিক ক্ষতি হলো– স্মরণশক্তি হ্রাস, উদ্যমের অভাব।
৫. মাদকাসক্তির আর্থিক ও নৈতিক ক্ষতি হলো– আর্থিক সংকট, চুরি, মিথ্যা বলা।
৬. বাংলাদেশ জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদে স্বাক্ষর করে– ১৯৯০ সালে।
৭. ১৮ বছরের নিচে মেয়ে ও ২১ বছরের নিচে ছেলে বিয়ে করলে সেটি হবে– বাল্যবিবাহ।
৮. বাল্যবিবাহের নীতি মানার মূল বাধা– দারিদ্র্য ও অশিক্ষা।
৯. মেয়েদের শরীর সন্তান প্রসবের উপযুক্ত হয় না– ১৮ বছরের নিচে।
১০. বাংলাদেশে যৌতুক নিরোধ আইন স্বাক্ষরিত হয়– ১৯৮০ সালে।
১১. যৌন নিপীড়নের শিকার বেশি হয়– কিশোরী মেয়েরা।
১২. প্রচার মাধ্যমের সঠিক ব্যবহার বাড়িয়ে দেয়– জ্ঞানের বিকাশ।
১৩. শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান শিশুদের বাড়ায়– বুদ্ধি ও সামাজিক দক্ষতা।
১৪. বর্তমানে অন্যতম একটি প্রচার মাধ্যম হলো– কম্পিউটার।
১৫. বিভিন্ন ধরনের তথ্য পাওয়া যায়– ইন্টারনেটের মাধ্যমে।
১৬. অতিরিক্ত কম্পিউটারে গেমস খেললে– ওজন বাড়ে, চোখের সমস্যা হয়, পিঠে ব্যথা হয়।
১৭. দ্রুত যেকোনো খবর ছড়িয়ে দেওয়ার একটি মাধ্যম হলো– ফেসবুক।

অধ্যায়-৮: খাদ্য পরিকল্পনা

১. মেনু তৈরির উদ্দেশ্য হলো– সুষম খাদ্য পরিবেশন।

Teachingbd.com

২. প্রতিদিনের খাদ্য নির্বাচন করতে হবে– ৫টি মৌলিক খাদ্যগোষ্ঠী থেকে।
৩. প্রতিবেলার খাদ্য নির্বাচন করতে হবে কমপক্ষে– ৩টি মৌলিক খাদ্যগোষ্ঠী থেকে।
৪. প্রোটিন জাতীয় খাদ্য খাতে ব্যয় করতে হবে মোট খাদ্য খাতের– ২৫%।
৫. খাদ্য খাতে খরচের ১৫% ব্যয় করতে হবে– তেল ও চিনি কেনার জন্য।
৬. শিশুর জীবনের সুস্থ ভবিষ্যতের ভিত রচনার অন্যতম সময়– ১০০০ দিন।
৭. শিশু মায়ের গর্ভে অবস্থান করে প্রায়– ২৭০ দিন।
৮. শিশুকে মায়ের বুকের দুধ পান করতে হবে– জন্মের পর প্রথম ৬ মাস
৯. শিশুর জন্মের পর মায়ের বুকের দুধ দিতে হবে– জন্মের এক ঘন্টার মধ্যে
১০. গর্ভবতী মাকে খাবারের সাথে গ্রহণ করতে হবে– ক্যালসিয়াম, ফলিক এসিড ও লৌহ ট্যাবলেট।
১১. শিশুর জন্ম পরবর্তী ২ বছরের পুষ্টি হলো– ৭৩০ দিনের পুষ্টি।
১২. ৪-৬ বছরের শিশুদের বলা হয়– প্রাক বিদ্যালয়গামী শিশু।
১৩. রোগ প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে– ভিটামিন ও ধাতব লবণ।
১৪. শিশুদের দাঁত ও হাড় গঠনে সহায়তা করে– ক্যালসিয়াম ও ভিটামিন 'ডি'।
১৫. ত্বকের ও চোখের সুস্থতার জন্য প্রয়োজন– ভিটামিন এ, বি ও সি।
১৬. প্রাক বিদ্যালগামী শিশুদের দুধ জাতীয় খাদ্য দিতে হবে– ৩-৪ পরিবেশন।
১৭. ১১-১৫ বছর বয়সী শিশুরা– বিদ্যালয়গামী শিশু।
১৮. বিদ্যালয়গামী শিশুদের দ্রুত বর্ধন বজায় রাখার জন্য প্রয়োজন– প্রোটিন জাতীয় খাদ্য।
১৯. বিদ্যালয়গামী ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের বেশি প্রয়োজন– লৌহ ও ফলিক এসিড।
২০. বিদ্যালয়গামী শিশুদের সচেতন হতে হবে– তেল ও মিষ্টি জাতীয় খাদ্য গ্রহণে।
২১. শরীরের ওজন স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি হলে তাকে বলা হয় – ওজনাধিক্য।
২২. ওজনাধিক্য শিশুদের সফট ড্রিংকস এর পরিবর্তে খেতে হবে– ডাবের পানি ও রসালো ফল।
২৩. ওজনাধিক্য শিশুর প্রতিবেলার খাদ্য তালিকায় রাখতে হবে– শাকসবজি, টক ফল ও মৌসুমী ফল।
২৪. ডুবো তেলে ভাজা খাবার বর্জন করতে হবে– ওজনাধিক্য শিশুদের।
২৫. নিয়মিত শারীরিক পরিশ্রম করতে হবে– ওজন কমানোর জন্য।
২৬. শরীরের ওজন দ্রুত বাড়ায়– ক্যালরিযুক্ত খাদ্য।
২৭. ওজন কমে যাওয়ার প্রধান কারণ– প্রয়োজনের চেয়ে কম খাওয়া ও পরিশ্রম বেশি করা।
২৮. স্বল্প ওজনের শিশুদের প্রোটিনের চাহিদা মেটাতে গ্রহণ করতে হবে-ডাল, বাদাম, মাছ, মাংস।
২৯. মিষ্টি জাতীয় খাদ্য– দ্রুত ওজন বাড়ায়।

অধ্যায়-৯: অপুষ্টি

১. খাদ্যের কাজ হলো দেহে– পুষ্টি সাধন করা।
২. Protein Calorie Malnutrition হলো– PCM।
৩. PCM সাধারণত দেখা যায়– দুই ধরনের।
৪. কোয়াশিয়রকর রোগে বেশি আক্রান্ত হয়– ১–৪ বছরের শিশুরা।
৫. কোয়াশিয়রকর হয়– প্রোটিনের অভাবে।
৬. শিশুদের ওজন কমে যায়, শরীরে পানি জমে, চুল বিবর্ণ হয়– কোয়াশিয়রকর হলে।
৭. ২ বছর বয়সী শিশুদের মধ্যে বেশি দেখা যায়– ম্যারাসমাস।
৮. ম্যারাসমাস হলে শিশুর ওজন হয়– শতকরা ৬০ ভাগের নিচে।
৯. ভিটামিন 'এ' এর অভাবজনিত রোগ– রাতকানা।
১০. দাঁতের মাড়ি ফুলে যায়, দাঁতের গোড়া দিয়ে রক্ত পড়ে– ভিটামিন 'সি' এর অভাবে।
১১. শিশুদের রিকেট ও বড়দের ওস্টিওম্যালেসিয়া হয়– ভিটামিন ' ডি' এর অভাবে।
১২. স্কার্ভি রোগ হয়– ভিটামিন 'সি' এর অভাবে।
১৩. শারীরিক ও মানসিক অবসাদ, অনিদ্রা, ক্ষুধামন্দা ও ওজন হ্রাস পায়– ভিটামিন বি এর অভাবে।
১৪. হাড় নরম, ভঙ্গুর ও ঝাঁঝরা হয়ে যায়– ক্যালসিয়ামের অভাবে।
১৫. রক্ত স্বল্পতা দেখা দেয়– লৌহের অভাবে।
১৬. আয়োডিনের অভাবে দেখা দেয়– গয়টার।
১৭. শিশুদের ক্রেটিনিজম হয়– আয়োডিনের অভাবে।

অধ্যায়-১০: পরিবারের জন্য খাদ্য নির্বাচন, ক্রয় ও প্রস্তুতে সতর্কতা

১. খাদ্য পরিকল্পনার মূল্য উদ্দেশ্য হলো– সুষম খাদ্যের ব্যবস্থা করা।
২. খাদ্য গ্রহণ ও চাহিদার ওপর প্রভাব বিস্তার করে– আবহাওয়া ও মৌসুম।
৩. যেকোনো অনুষ্ঠানে বিশেষ আকর্ষণের বিষয়– মেনু।
৪. খাদ্য তালিকার ভিন্নতা দেখা দেয়– উপলক্ষভেদে।
৫. উৎসবের ধরন, অতিথিদের বয়স, রুচি অনুযায়ী ভিন্ন হয়– খাদ্য পরিকল্পনা।
৬. খাদ্য পরিবেশন ব্যবস্থার ধরন নির্ভর করে– অনুষ্ঠানের প্রকৃতি ও পরিবেশনের ভিন্নতার ওপর।
৭. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, অফিসে দেখা যায়– ট্রে পরিবেশন পদ্ধতি।
৮. মিলাদ ও সেমিনারে খাবার পরিবেশন করা হয়– প্যাকেট পরিবেশনে।
৯. বাড়ির লন, বারান্দা, ড্রইংরুমে ব্যবস্থা করা যায়– বুফে পরিবেশন।
১০. খাদ্য নির্বাচন ও ক্রয়ে থাকতে হবে– দক্ষতা ও নৈপুণ্যতা।

অধ্যায়-১১: খাদ্য রান্না

১. দুধ ও চিনিতে সাদা ভাব আনতে ব্যবহৃত হয়– হাইড্রোজ।
২. অপরিণত ফল পাকানোর জন্য ব্যবহৃত হয়– কার্বাইড।
৩. জিলাপি ও চানাচুর মচমচে করতে ব্যবহৃত হয়– মবিল।
৪. মুড়িকে সাদা ও বড় করার জন্য ব্যবহৃত হয়– ইউরিয়া।
৫. চা পাতার সাথে মেশানো হয়– কাঠের গুঁড়া।
৬. ভেজাল মিশ্রিত খাবারকে বলা হয়– Slowpoison।
৭. মাছ ও দুধ দীর্ঘদিন অবিকৃত রাখতে ব্যবহৃত হয়– ফরমালিন।
৮. ময়দায় সাদা ভাব আনার জন্য ব্যবহৃত হয়– কৃত্রিম পাউডার।
৯. প্রোটিন জাতীয় খাদ্য হলো– মাছ, মাংস, ডিম।
১০. খোসাযুক্ত সবজি কাটতে হয়– বড় বড় টুকরা করে।
১১. খোসাযুক্ত সবজির খোসার নিচে থাকে– ভিটামিন সি।
১২. শাকসবজি কেটে পানিতে ভিজিয়ে রাখলে অপচয় হয়– ভিটামিন বি ও ভিটামিন সি।
১৩. দ্রুত পচনশীল খাদ্য– মাছ, মাংস।
১৪. এক মৌসুমের খাদ্য অন্য মৌসুমে খাওয়া যায়– প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে।
১৫. ফল ও সবজি সংরক্ষণের জন্য ভাপ দেওয়াকে বলে– Blanching।
১৬. Blanching করার ফলে ধ্বংস হয়– খাবারের এনজাইম।
১৭. নির্বীজনকরণ এর জন্য বন্ধ টিনের কৌটায় তাপ দেওয়া হয়– ৩০–৪০ মিনিট।

http://teachingbd.com

১৮. নির্বীজনকরণের জন্য ফলের ক্ষেত্রে তাপমাত্রা প্রয়োজন হয়– ১০০° সে.।
১৯. নির্বীজনকরণের জন্য সবজির ক্ষেত্রে তাপমাত্রা প্রয়োজন– ১১৬° সে.।
২০. ডিপফ্রিজের বরফ চেম্বারে ৬/৭ মাস মাছ, মাংস রাখা যায়– ১৮° সে. থেকে– ৪০° সে. ঠান্ডায়।
২১. ফল ও সবজি ফ্রিজে সংরক্ষণ করা যায়– ০° থেকে– ৫° সে. তাপমাত্রায়।
২২. খাদ্য রান্নার মূল উদ্দেশ্য খাদ্যকে– সুস্বাদু ও আকর্ষণীয় করা।
২৩. রান্নার মাধ্যমে খাদ্যের স্বাদ, বর্ণ, গন্ধ– উন্নত হয়।
২৪. খাদ্যের রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে– রান্নার ফলে।
২৫. সিদ্ধ করার ফলে মাংসের সংযোজক কলার কোলাজেন পরিণত হয়– জিলেটিনে।
২৬. শস্যদানা ও সবজির শ্বেতসার কণা ড্রেক্সট্রিন উত্তাপে পরিণত হয় – মলটজে।
২৭. ভোজ্যদ্রব্যের আকর্ষণ নির্ভর করে– বুনটের ওপর।
২৮. খাদ্যের অবয়বিক অবস্থা বোঝানো হয়– বুনট দ্বারা।
২৯. খাদ্যের জীবাণু ধ্বংস হয়– ৪৫°সে. – ৬০° সে. তাপমাত্রায়।
৩০. রান্না মূলত একটি– রাসায়নিক প্রক্রিয়া।
৩১. অধিক তাপে খাদ্য ফুটানো হয়– ১০০°সে. বা ২১২° ফা.।
৩২. মৃদু তাপে সিদ্ধ পদ্ধতিতে তাপমাত্রা থাকে– ৮২°সে. থেকে ১০০° সে. পর্যন্ত।
৩৩. ভাপে সিদ্ধ পদ্ধতিতে প্রয়োজন হয়– ১০০° সে. থেকে ১১২° সে. তাপমাত্রা।
৩৪. ভাজা পদ্ধতিতে তাপমাত্রা প্রয়োজন– ৩০০° সে.।
৩৫. খাদ্যদ্রব্য বাতাসের সংস্পর্শে কম আসে ও দ্রুত ভাজা হয়– ডুবো তেলে ভাজা পদ্ধতিতে।
৩৬. খাদ্যের চারদিকে সমানভাবে তাপ প্রয়োগ করা হয়– বেকিং পদ্ধতিতে।
৩৭. তাপমাত্রা ও সময় নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা থাকে– ওভেনে।
৩৮. রন্ধনকারীর পোশাক হতে হয়– জীবাণুমুক্ত ও পরিচ্ছন্ন।

অধ্যায়-১২: সুতা তৈরি ও বুনন

১. সুতার মূল উপাদান হলো– তন্তু।
২. লম্বা তন্তু থেকে উৎপাদিত সুতা হয়– মসৃণ ও উজ্জ্বল।
৩. তুলা, ফ্ল্যাক্স ও পশম তন্তুর ক্ষেত্রে সুতা তৈরির প্রথম পর্যায়– কার্ডিং।
৪. তন্তু থেকে আলগা ময়লা, ধুলা দূর হয়– কার্ডিং এর মাধ্যমে।
৫. সুতা তৈরির দ্বিতীয় পর্যায় হলো– কম্বিং।
৬. তন্তুর পাতলা আস্তরণকে বলে– স্লাইভার।
৭. কয়েকটি রেশম তন্তুকে একত্রে পেঁচিয়ে রাখাকে বলে– রিলিং।
৮. তন্তু থেকে সুতা তৈরির সর্বশেষ পর্যায়– স্পিনিং।
৯. সুতার মোচড়ের পরিমাণ ভিন্ন হয়– তন্তুর দৈর্ঘ্য ও গুণাগুণ ভেদে।
১০. তাঁতের মধ্যে লম্বালম্বিভাবে সাজানো সুতাকে বলে– টানা বা ওয়ার্প।
১১. মাকুর সাহায্যে আড়াআড়িভাবে চালিত সুতাকে বলে– পড়েন বা ওয়েফ্‌ট।
১২. কাপড় খুব মসৃণ ও টেকসই হয়– সাদাসিধা বুননে।
১৩. কাপড় ময়লা হলে চোখে পড়ে ও সহজেই পরিষ্কার করা যায়– সাদাসিধা বুননে।
১৪. ময়লা হলে সহজে বোঝা যায় না– টুইল বুননের কাপড়।
১৫. স্যাটিন বুননে কাপড়ের উপরিভাগের সুতা থাকে– ভাসমান অবস্থায়।
১৬. সচরাচর ব্যবহারের জন্য উপযোগী নয়– স্যাটিন বুননের কাপড়।

অধ্যায়-১৩: পোশাক নির্বাচনে বিবেচ্য বিষয়

১. পোশাক নির্বাচনে প্রথম বিষয় বিবেচ্য– আয়।
২. পোশাক নির্বাচন করতে হয়– শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক চাহিদা অনুযায়ী।
৩. নবজাতকের পোশাক হবে– হালকা রঙের, নরম জমিন ও সাধারণ ডিজাইনের।
৪. দুর্ঘটনা এড়াতে নবজাতকের পোশাকে বর্জন করতে হবে– হুক, সেফটিপিন ও বোতাম।
৫. প্রাক বিদ্যালয়গামী শিশুদের জন্য নির্বাচন করতে হবে– আত্মনির্ভরশীল পোশাক।
৬. পোশাক নির্বাচনে আমরা প্রাধান্য দেই– তিনটি ঋতুকে।
৭. গ্রীষ্মকালে নির্বাচন করা উচিত– সুতি ও লিনেন বস্ত্র।
৮. বর্ষা ঋতুতে ধোয়া ও শুকানোর সুবিধার জন্য ব্যবহার করা হয়– নাইলন, টেট্রন, পলিয়েস্টার।
৯. সামাজিক নিরাপত্তা ও মানসিক তৃপ্তি আনে– সমাজ ও সম্প্রদায় স্বীকৃত পোশাক।
১০. মনিপুরী মহিলাদের পোশাকের নাম– ফনেক।

অধ্যায়-১৪: পোশাক ক্রয়ে বিবেচ্য বিষয়

১. পোশাকের সামগ্রিক সৌন্দর্য হচ্ছে– ফিনিশিং।
২. স্টিচিং হলো– পোশাকের সেলাইয়ের মান ও প্রকৃতির ধরন।
৩. পোশাকের স্থায়িত্ব নির্ভর করে– স্টিচিং এর উপর।
৪. পোশাকের সেলাইয়ের ধারে কাপড় রাখতে হবে– ১.৩ সে.মি. বা ০.৫ ইঞ্চি।
৫. পোশাকের যেসব স্থানে চাপ পড়ে সেসব স্থানে সেলাই দিতে হবে– দুইবার।
৬. পোশাকের লেবেলের মাধ্যমে জানা যায়– মূল্য, সাইজ, যত্নের উপায়।
৭. সেলাইয়ের বাইরের অংশে দেওয়া হয়– ওভারলকিং সেলাই।
৮. পোশাক পরিধানকারীর প্রকৃত মাপের সাথে সেলাইয়ের জন্য বাড়তি যোগ করা হয়– ১ ইঞ্চি।
৯. পরিধানকারীর প্রকৃত মাপের সাথে আরামদায়কতার জন্য বাড়তি যোগ করতে হয়– ২ ইঞ্চি।

অধ্যায়-১৫: পোশাক তৈরি

১. পোশাক ছাঁটার আগে কাপড় প্রস্তুত করা হয়– তিনটি পদ্ধতিতে।
২. সংকুচিত করার ক্ষেত্রে কাপড় পানিতে ভিজিয়ে রাখতে হবে– ৮/৯ ঘণ্টা।
৩. কাপড় দ্রুত সংকুচিত করার দরকার হলে ঠান্ডা ও গরম পানিতে ভিজিয়ে রাখতে হবে– ৫–১০ মিনিট।
৪. কাপড় সংকুচিত করার পর কাপড়ে– ভাঁজ পড়ে।
৫. কাপড়ের কুঁচকানো ভাব দূর করা যায়– ইস্ত্রি করে।
৬. কাপড় ইস্ত্রি করতে হয়– উল্টোদিকে, লম্বালম্বিভাবে।
৭. বস্ত্রের তন্তুর প্রকৃতি অনুসারে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে– ইস্ত্রির তাপমাত্রা।
৮. রঙিন কাপড়ের রং পাকা করতে ১ গজ কাপড়ে প্রয়োজন– একমুঠো লবণ।
৯. রঙিন কাপড়ের রং পাকা করতে কাপড় পানিতে ভিজিয়ে রাখতে হবে– ১ ঘণ্টা।
১০. মানানসই ফিটিং পোশাক তৈরির পূর্বশর্ত সঠিকভাবে পরিধানকারীর– দেহের মাপ নেওয়া।
১১. কাপড় ছাঁটা ও সেলাই করা হয়– চূড়ান্ত নকশা অনুযায়ী।
১২. কোমর, বুক ও হিপের মাপ নেওয়ার সময় ফিতার নিচে বিছিয়ে রাখতে হবে– চারটি আঙুল।
১৩. হাতার ঘের ও প্যান্টের মৌরীর মাপ নিতে ফিতার নিচে রাখতে হবে– দুটি আঙুল।
১৪. পায়জামা, প্যান্ট ও সালোয়ারের পায়ের ঘেরের মাপকে বলে– মৌরী।
১৫. বাহু বা কব্জির ঘেরের মাপকে বলে– মুহরি।
১৬. পোশাকের লম্বা মাপ হলো– ঝুল।
১৭. কাপড় ছাঁটার সময় লক্ষ রাখতে হবে– ছাপার দিকে।

Teachingbd.com